দৈনিক সংবাদ

অভিমত

শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বোর্ড কি দায়িত্বশীল হবে না?

ফজলুর রহমান সিদ্দিকী

সমস্যাটি গেল কয়েক বছর ধরে চরম আকার ধারণ করেছে। এবং এখনো পর্যন্ত এর কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধানও দিতে পাচ্ছে না আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলো। পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার পর মেধা তালিকা-ভুক্তসহ হাজার হাজার পরীক্ষার্থী কোন কোন বিষয়ে অবিশ্বাস্য রকম কম নম্বর প্রাপ্তির অভিযোগ তুলছে। তারা বলছে, এত কম নম্বর তারা কিছুতেই পেতে পারে না। অভিভাবকরা, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকরা বিস্মিত হচ্ছেন কোন কোন বিষয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের অবিশ্বাস্য রকম কম নম্বর দেখে। তাদের বেশির ভাগই উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করেছেন; কিন্তু শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে তারা সঠিক আচরণ কিংবা যথার্থ উত্তর পাচ্ছেন না।

বরাবরের মতো এবারেও ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক '৯৭-এর অসংখ্য পরীক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন অথবা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন জানিয়েছে। এ জন্য নির্ধারিত ফিসও জমা দিয়েছে তারা। এতে বোর্ডের আয় হয়েছে একটি বড় অংকের টাকা। আগের বছরগুলোর তুলনায় এবারের অভিযোগের ধরন যেমন ভিন্ন, সংখ্যাও তেমনি ব্যাপক। একমাত্র ঢাকার ভিকারুন্নেছা নুন কলেজের ৫০ জন মেধাবী ছাত্রী তাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্রে পরীক্ষক বিদ্বেষমূলকভাবে অস্বাভাবিক কম নম্বর প্রদান করেছেন বলে অভিযোগ করেছে। খবরটি পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ইংরেজিতে লেটার নম্বরসহ এসএসসি '৯৫-এর মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক '৯৭-এর মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেও বেশ কিছু পরীক্ষিত মেধাবী ছাত্র একই পত্রে আশানুরূপ নম্বর পায়নি বলেও অভিযোগ করেছে। অথচ একই বিষয়ে এদের অনেকেই এক পত্রে ৮০ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে। অন্য পত্রে পেয়েছে ৩৮ থেকে ৫৮ নম্বর মাত্র।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় উপরের দিকে স্থান লাভে সমর্থ পরীক্ষার্থীরা আশানুরূপ পরীক্ষা দিয়েও যদি কোন পত্রে অস্বাভাবিক কম নম্বর পায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মহল অর্থাৎ সেই পরীক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকগণ পরীক্ষকদের সদিচ্ছা কিংবা যোগ্যতার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হতেই পারেন। সে কারণে প্রত্যেকের আবেদনগুলো যথাযথভাবে যাচাই করে তাদের সন্তুষ্ট করা বোর্ড কর্তৃপক্ষের একটি সমীচীন কাজ বলেই আমরা মনে করি। ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত ফিসের বিনিময়ে তারা যেন নিজেদের উত্তরপত্রগুলো স্বচক্ষে দেখতেপারে— সে কাজটিও সত্য সন্ধানের স্বার্থেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারেন।

আমি জানিনে, আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হবার আগেই এবারের আবেদনগুলো বোর্ড কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা, যেভাবে তারা কাজটি বরাবরই করে যাচ্ছেন। আমাদের শিক্ষা বোর্ডগুলো যৌথভাবে সম্পাদন করা এক একটি মেশিন- যা ভুলভ্রান্তির বাইরে নয়, হতে পারে না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ধরনের যতই আবেদন পড়ুক না কেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসবকে কখনোই একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যে নিচ্ছে না। তারা এই বিষয়টি একবারও ভেবে দেখে না যে, ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্রের মূল্যায়নে যাদের তারা নিয়োগ করেন তাদের কতজন যথার্থভাবে সেই কাজটি সম্পাদন করেন, কতজন সৎ থাকেন, কতজন সত্যি সত্যি উপযুক্ত থাকেন। এমনকি এও ভেবে দেখেন না, যেসব মেধাবী ছাত্রছাত্রী অবিশ্বাস্য রকম কম নম্বর পাওয়ার অভিযোগ তুলছে তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের দাবিগুলো সত্যি সত্যিই সঠিক দাবি হতে পারে।

সাতানব্বই-এঁর উত্থাপিত অভিযোগগুলো যদি সত্যি সত্যিই এরই মধ্যে ফয়সালা হয়ে যায় তাহলেও আমি ভবিষ্যতের জন্য এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা আর পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ করব বোর্ড কর্তৃপক্ষকে। আমরা কে না জানি এবং অনেক ক্ষেত্রে এটি সর্বজনবিদিত সত্যও যে, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক শ্রেণীর প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ কিংবা একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে ওঠার অভিযোগ আছে। শিক্ষা বিভাগের কোন দপ্তরে চরম অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অবহেলা চলতে থাকার কথাও নতুন কিছু আবিষ্কার নয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সঠিক মান ও গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা, পরীক্ষক নিয়োগে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার অভিযোগ নিরন্তরই উঠছে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে। পরীক্ষার ফলাফলে মেধাতালিকাভুক্তদের মধ্যেও মাত্র দুই অথবা এক নম্বর করে তফাৎ থাকতে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। আবশ্যিক যে কোন বিষয়ে পাস নম্বর অপেক্ষা এক নম্বর কম পেলেও পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর প্রদানের বিষয়টি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্যাটি প্রতিবছরই বিভিন্ন মহলে আলোচিত হয়, কিন্তু এ যাবৎ তার নিরসনের লক্ষণ নেই। সে কারণে একজন মেধাবী ছাত্র ভাল পরীক্ষা দিয়েও যখন কোন বিষয়ে বা পত্রে অবিশ্বাস্যরকম কম নম্বর পাচ্ছে তখন কেবলমাত্র তাদের জীবনে সংকটই নেমে আসছে না, একই সাথে অন্যদের মনেও সন্দেহ দানা বাঁধছে। অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। প্রচলিত যে পুনঃনিরীক্ষণ বা পুনর্মূল্যায়ন ব্যবস্থা আছে- তাতে অবশ্য কেবলমাত্র বিরল ক্ষেত্রেই নম্বর পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য দরখাস্ত করেছে বিগত বছরগুলোতে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না কিছুই। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে একেবারেই গুরুত্বের মধ্যে নিচ্ছে না। ফলে অসংখ্য অসহায় অভিভাবককে খাতা পুনর্মূল্যায়নে অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয়ের ঝামেলাই কেবল পোহাতে হচ্ছে।

ইত্যাদি সঙ্গত কারণেই খাতা দেখা আর নম্বর দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে নানা অভিযোগ আর জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বিভিন্ন মহলে। জানা গেছে, প্রথমত উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা ও ইংরেজি উত্তরপত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশি। ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, পরীক্ষক স্বল্পতা এবং দ্রুত ফল প্রকাশের তাড়া থাকায় এই দুই বিষয়ে পরীক্ষকভেদে প্রত্যেকে ৮শ' থেকে ১৫শ' খাতা পেয়ে থাকেন। একইভাবে একজন প্রধান পরীক্ষক ৮ থেকে ১০ হাজার উত্তরপত্র পেয়ে থাকেন। প্রবীণ বলে অনেক প্রধান পরীক্ষকও দেড় থেকে দু' হাজার খাতা মূল্যায়নের জন্য পান। এসব উত্তরপত্র যেমন সঠিকভাবে মূল্যায়িত ও নিরীক্ষিত হওয়া দরকার, তেমনি ওএমআর-এর বৃত্তগুলোও নির্ভুলভাবে ভরাট হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু ভুক্তভোগীদের বদ্ধমূল ধারণা যে, ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় বলেই একই ছাত্র একই রকম পরীক্ষা দিয়েও এক পত্রে পায় ৮০ বা তদূর্ধ্ব, অন্য পত্রে পায় ৩৮ কিংবা ৫০ নম্বর। সমস্যাটিকে কেবলমাত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষই সুরাহা করতে পারেন যদি তাদের সদিচ্ছা থাকে।

কমবেশি সকল বিষয়েই এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। গুজব আছে যে, বাংলা ও ইংরেজিতে উত্তরপত্রের সংখ্যাধিক্যের সুযোগে একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক অনভিজ্ঞ কিংবা অপরীক্ষক ব্যক্তিকে দিয়েও খাতার মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ এবং বৃত্ত ভরাটের কাজটি করিয়ে নেন। বহু জায়গায় দেখা গেছে, এ ধরনের 'সাব কনট্রাক্ট'-এর মাধ্যমে খাতা দেখার কাজটি দেদার চলছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মেধা মূল্যায়নের কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদন হচ্ছে না। ভুল বৃত্ত ভরাটের কারণে ৮২ নম্বর এক নিমিষে ২৮ হয়ে যাচ্ছে! এতে জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের, কিন্তু এমন একটি অপরাধের জন্যে সেই অসাধু বা অযোগ্য পরীক্ষকদের কিছুই হচ্ছে না। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে।

বোর্ডের অবহেলা আর চিরাচরিত ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিপ্রবণ কিংবা অনভিজ্ঞ ভাড়াটে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকগণও নিয়োগ পেয়ে থাকেন ছাত্রছাত্রীদের খাতা দেখার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে। কেন জানিনে, এই শ্রেণীর অযোগ্য আর ভাড়াটের অধীনে অধিক সংখ্যক খাতা ন্যস্ত হওয়ারও অভিযোগ আছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকগণের কেউ কেউ নম্বর প্রদানের নীতিমালা অনুসরণ না করায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহারিক পরীক্ষাতেও নম্বর প্রদানে বৈষম্যের অভিযোগ থাকায় সংকট দিনে দিনেই বাড়ছে। আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন নিয়ে সচেতন ভূমিকা না রাখেন, তাহলে আর কে রাখবে?

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোন কোন প্রবীণ শিক্ষকও আবার পরীক্ষক হতে আগ্রহী হন না। কেউ কেউ নম্বর প্রদানে অহেতুক কার্পণ্য করেন এবং নম্বর বৈষম্যের অহেতুক অবকাশ সৃষ্টি করেন। যেহেতু উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের সে রকম কোন বিধান নেই সেহেতু প্রথমেই কাজটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে বোর্ডের কাছে একজন শিক্ষানুরাগী হিসেবে আমার একটি প্রস্তাব আছে। পরীক্ষক স্বল্পতা নিরসনে অধ্যাপনারত সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে, সবাইকে অনধিক ৪শ' খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব দিতে হবে এবং তাদের জন্য বর্তমান পারিতোষিকের হার বৃদ্ধি করতে হবে। এতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

নির্ভুল ও সঠিক উত্তরপত্র মূল্যায়নে সক্ষম পরীক্ষককেই কেবলমাত্র অতিরিক্ত খাতা পেতে পারেন, প্রতিটি বোর্ডে এই নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। বোর্ড অফিসের গোপন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে খাতা মূল্যায়নে সক্ষম, সৎ ও অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা (সম্ভবত এরকম ব্যক্তিত্বের অভাব নেই) অবশিষ্ট খাতাগুলো মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে কিছুটা খরচ কিংবা ঝামেলা বাড়লেও ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রতি সুবিচার করা হবে এবং গোটা পরিস্থিতিতে সুফল আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পাশাপাশি বিধি-বহির্ভূতভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক, ত্রুটিযুক্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী, অবৈধভাবে পরীক্ষার সুযোগ দানকারী অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নম্বর বর্ধিতকরণে তদবিরকারীদের অপতৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। এ না করলে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি ঘটবে না। পরীক্ষা ফল প্রস্তুতিতে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে ঠিকই, তবে এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকেই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। ব্যক্তিগত লাভের লোভে যারা গোটা শিক্ষা প্রক্রিয়াকেই কলুষিত করছে তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করতে হবে। সৎ, দক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পুরস্কৃত করতে হবে।

শেষ কথা, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতে যখন বিশৃংখলা ও দুর্নীতি জেঁকে বসেছে, শিক্ষার মান যখন আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নগামী হচ্ছে, তখন পাঠমনস্ক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রাপ্য নম্বর নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি কিংবা ত্রুটি নিরসনের পরিবর্তে তা এড়িয়ে যাবার প্রয়াসটি হবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রের শামিল। ভুল তো হতেই পারে। তবে সে ভুল শুধরাবার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। যেহেতু দেশের কল্যাণেই গড়ে তোলা হয় শিক্ষাব্যবস্থা, সেহেতু বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও কোন পরীক্ষার্থীই যেন তার প্রাপ্য নম্বর বঞ্চিত না হয়- সে ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।

এইচএসসি '৯৭-এর ফল গ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন, "পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম দূর করুন। শিক্ষা প্রশাসনের দৃষ্টি সেদিকেই আকর্ষণ করছি।"

তারিখ 07 MAR 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...